একনজরে উম্মাহর ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

বই	একনজরে উম্মাহর ইতিহাস (১ম খণ্ড)
লেখক	মাওলানা ইসমাইল রাইহান
অনুবাদক	রাইহান খাইরুল্লাহ রহ. আবদুল্লাহ আল ফারুক নুরুযযামান নাহিদ ড. মাওলানা ইমতিয়াজ আহমদ
বানান সংশোধন	মাকতাবাতুল আযহার টিম

একনজরে উম্মাহর ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

মূল

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল রাইহান

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জামিয়াতুর রশিদ, করাচি

ভাষান্তর

রাইহান খাইরুল্লাহ রহ.

আবদুল্লাহ আল ফারুক

নুরুযযামান নাহিদ

ড. মাওলানা ইমতিয়াজ আহমদ

মাকতাবাতুল আমহার

- প্রথম প্রকাশ
  মে ২০২৫ খ্রি.

- গ্রন্থস্বত্ব
  প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত। মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত। দোকান নং : ১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত। ১. কওমি টাওয়ার, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার থেকে মুদ্রিত।

- ইমেইল
  maktabatulazhar2@gmail.com
- প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
  ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা : ০১৯ ২৪ ০৭ ৬৩ ৬৫
- শাখা বিক্রয়কেন্দ্র - ১
  ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৭১৫ ০২ ৩১ ১৮
- শাখা বিক্রয়কেন্দ্র - ২
  ১, কওমি টাওয়ার, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬৮৭ ১৮৩০ ১২
- প্রুফ ও নিরীক্ষণ
  মুরশিদুল হাসান শামীম, মাও. আবদুল্লাহ আল মামুন
- প্রচ্ছদ ও নামলিপি
  কাজী যুবাইর মাহমুদ ও হাশেম আলী
- মূল্য
  পূর্ণ সেট ৩৬০০/= টাকা মাত্র

সূচিপত্র

গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট	২১
লেখকের আরজ	২৩
ভূমিকা : ইতিহাসের প্রাথমিক আলোচনা	২৬
ইতিহাস শাস্ত্রের প্রাথমিক আলোচনা	**২৭**
ইতিহাসের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা	২৭
বিষয়বস্তু	২৭
ইতিহাসের উদ্দেশ্য	২৭
ইতিহাসের উপকারিতা	২৮
ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য	২৯
মূলনীতি অবলম্বন না করে ইতিহাস পাঠের ক্ষতি	২৯
ইতিহাস শাস্ত্রের ইতিহাস	**৩২**
ক্যালেন্ডার প্রবর্তন	৩৩
ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি ও সেগুলোর রচয়িতা	**৩৬**
১. তারীখে খলিফা বিন খাইয়াত	৩৬
২. তারীখে তবারী	৩৬
তারীখে তবারীর কিছু বৈশিষ্ট্য	৩৭
দুর্বলতা	৩৭
৩. আল কামিল ফিত তারীখ	৩৮
এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৯
দুর্বলতা	৩৯
৪. তারীখুল ইসলাম	৪০
বৈশিষ্ট্য	৪০
৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	৪১
বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪১
৬. তারীখে ইবনে খালদুন	৪২
৭. তারীখুল খোলাফা	৪৩
ইতিহাস রচনার উৎস	**৪৪**
প্রত্যক্ষদর্শী	৪৪
একজন থেকে আরেকজনের বর্ণনা	৪৪
লিপিবদ্ধ উৎস	৪৪

প্রাচীন নিদর্শন	৪৫
ইতিহাস রচনার ধারা	৪৫
১. বর্ণনার মাধ্যমে ইতিহাস রচনা	৪৫
২. দিরায়াতের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা	৪৫
৩. বর্ণনা ও যুক্তির মাধ্যমে ইতিহাস রচনা	৪৬
ঘটনাবলির যৌক্তিক বিন্যাস	৪৬
সাংবাদিকতার ছয়টি মৌলিক প্রশ্ন	৪৬
ঐতিহাসিক বর্ণনাবলির বিশ্লেষণ	**৪৮**
আদালাতে সাহাবা ও ঐতিহাসিক বর্ণনা	৪৮
সাহাবিরা নিষ্পাপ নন, গুনাহ থেকে নিরাপদ	৪৯
সাহাবিদের নিন্দা যুক্ত বর্ণনাগুলোর গবেষণা কেন জরুরি?	৫০
ঐতিহাসিক বর্ণনা যাচাই, বর্ণনা ও বর্ণনাকারীর স্তর	৫০
বর্ণনার স্তর : সহিহ, হাসান, যয়িফ	৫১
সাহাবিদের নিন্দা যুক্ত যয়িফ বর্ণনা	৫২
সাহাবিদের নিন্দা যুক্ত সহিহ বর্ণনা গ্রহণীয় কি না?	৫২
ইতিহাসের দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ বা বর্জনের মাপকাঠি	৫৩
ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রে পার্থক্য	৫৪
কখন সনদ যাচাই জরুরি?	৫৫
কজন প্রসিদ্ধ ইতিহাস বর্ণনাকারীর পরিচয়	৫৬
সীরাত শাস্ত্রের পরিচয়	৫৯
সীরাত শাস্ত্রের উপকারিতা	৬০
সীরাত সংকলন, সীরাত ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক	৬১
সীরাত রচনার উৎস	৬১
কয়েকজন বিখ্যাত সীরাত রচয়িতা	৬৩
এ প্রসঙ্গে সহায়ক গ্রন্থাবলি	৬৬
প্রথম অধ্যায় : নবীজির সীরাত	
প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ববর্তী নবীগণ ও বিগত জাতিসমূহ	৬৭
পৃথিবীর সূচনা ও আদম আ.-কে সৃষ্টি	৬৮
পৃথিবীতে মানুষের আগমন, আদম আলাইহিস সালাম	৬৯
মানুষের সঙ্গে শয়তানের শত্রুতা	৬৯
মানব বংশধারা বৃদ্ধি	৭০
নুহ আলাইহিস সালাম	৭০
হুদ আলাইহিস সালাম	৭১
সালেহ আলাইহিস সালাম	৭১

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম	৭২
ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত	৭২
ইসমাইল আলাইহিস সালাম ও কাবাঘর পুনর্নির্মাণ	৭৩
বনি ইসরাইলের নবীগণ	৭৫
ইউসুফ আলাইহিস সালাম	৭৫
হযরত মুসা আলাইহিস সালাম	৭৬
ইউশা বিন নুন আ.	৭৮
আহদে কুযাত ও আহদে মুলুক	৭৮
বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্টতা, পতন ও দাসত্ব	৭৮
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম	৮০
ঈসা আ.-এর পর বনি ইসরাইলের অবস্থা	৮০
খ্রিস্টধর্মের বিকৃতি	৮১
এ প্রসঙ্গে সহায়ক গ্রন্থাবলি	৮২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ইসলামপূর্ব পৃথিবীর অবস্থা	
ইসলামপূর্ব পৃথিবীর অবস্থা	৮৩
হিন্দু ধর্ম	৮৩
বৌদ্ধ ধর্ম	৮৫
ইরানের ধর্মীয় বিপর্যয়	৮৬
চীনের আকিদাগত অবস্থা	৮৭
ইউরোপের চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়	৮৮
গ্রিক দার্শনিকগণ	৯০
প্রগল্‌ভতা	৯১
পথভ্রষ্টতার আঁধারে নিমজ্জিত ইহুদি জাতি	৯২
আরবের ধর্মীয় অবস্থা	৯৪
আরবদের চারিত্রিক অবস্থা	৯৬
আরবদের কাব্যচর্চা	৯৭
জাযিরাতুল আরবে আসমানি দান কেন?	৯৮
এ প্রসঙ্গে সহায়ক গ্রন্থাবলি	১০০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ শেষ নবীর সীরাত	
শেষ নবীর সীরাত (মক্কার জীবন)	১০২
সৌভাগ্যময় জন্ম	১০২

লালনপালন	১০৩
পবিত্র শৈশব	১০৩
ফিজার যুদ্ধ	১০৩
হিলফুল ফুযুল	১০৪
জীবিকা উপার্জন	১০৪
খাদিজা রা.-এর সঙ্গে বিবাহ	১০৪
কাবা পুনর্নির্মাণ ও হাজরে আসওয়াদ স্থাপন	১০৫
প্রথম ওহি	১০৬
দাওয়াতের সূচনা	১০৭
গোপনে দাওয়াত	১০৭
বংশের লোকদের ইসলামের দাওয়াত	১০৭
গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত	১০৮
হাবাশায় হিজরত	১০৯
হামযা রা.-এর ইসলাম গ্রহণ	১১০
উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ	১১১
শিয়াবে আবু তালিবে অবরোধ ও সামাজিক বয়কট	১১৩
আবু তালিব ও খাদিজা রা.-এর ইন্তেকাল	১১৪
তায়েফ সফর	১১৪
মিরাজের সফর	১১৬
আউস-খাযরাজ গোত্রে ইসলামের প্রসার	১১৮
এ প্রসঙ্গে সহায়ক গ্রন্থাবলি	১২০
নবীজির মাদানি জীবন	
মদিনায় হিজরত	১২১
ইয়াসরিবে অভ্যর্থনা	১২১
মসজিদে নববী নির্মাণ ও কেবলা পরিবর্তন	১২২
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব	১২৩
মদিনা সনদ	১২৩
বদর যুদ্ধ	১২৪
জিহাদের অনুমতি	১২৫
প্রাথমিক সারিয়্যা ও প্রথম গাযওয়া	১২৫
কুরাইশের কাফেলার আগমন	১২৬
সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ	১২৭
বদর প্রান্তরে	১২৭
হক-বাতিলের লড়াই, আবু জাহলের মৃত্যু	১২৮
মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়	১২৯

উহুদ যুদ্ধ	১৩০
মুসলিম বাহিনীর রওনা	১৩১
উহুদ প্রাঙ্গণে	১৩১
সাহাবিদের অনুপম আত্মত্যাগ	১৩৩
আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথন	১৩৫
উহুদের শহীদগণ	১৩৫
যুদ্ধের ফলাফল	১৩৬
রজীর মর্মান্তিক ঘটনা	১৩৬
বীরে মাউনার বেদনাবিধুর ঘটনা	১৩৮
গাযওয়ায়ে বনু লিহয়ান	১৩৯
প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধ (যিলকদ, ৫ হি.)	১৪০
গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিক (শাবান, ৫ হি.)	১৪১
খন্দক যুদ্ধ	১৪১
পরিখা খনন	১৪২
সম্মিলিত বাহিনীর আগমন ও মদিনা অবরোধ	১৪৩
ব্যর্থ কাফেরদের পলায়ন	১৪৪
হুদাইবিয়ার সন্ধি	১৪৫
কুরাইশের সঙ্গে আলোচনা, উসমান রা.-কে দূত হিসেবে প্রেরণ, বাইয়াতে রিদওয়ান	১৪৫
সন্ধিনামা	১৪৬
আবু জান্দালকে হস্তান্তর	১৪৮
কাযা উমরা	১৪৯
ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৫০
গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা	১৫০
গাযওয়ায়ে বনু নাযির	১৫১
গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা	১৫১
খায়বার যুদ্ধ	১৫২
ফাদাক ও ওয়াদিল কুরা বিজয়	১৫৩
মক্কা বিজয়	১৫৪
কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গ	১৫৪
মুসলিম বাহিনীর রওনা	১৫৪
বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ	১৫৫
মক্কার আশপাশের উপাসনালয় ধ্বংস	১৫৬

হুনাইন যুদ্ধ	১৫৭
তায়েফ অবরোধ	১৫৮
ইসলামের বৈশ্বিক দাওয়াত	১৫৯
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৬০
মুতা যুদ্ধ	১৬১
তাবুক যুদ্ধ	১৬৩
মুনাফিকদের কীর্তিকলাপ	১৬৫
উহুদ যুদ্ধে ফেতনা ছড়ানো	১৬৫
মুরাইসি যুদ্ধে মুনাফিকদের বিশৃঙ্খলা	১৬৫
ইফকের ঘটনা	১৬৬
খন্দক যুদ্ধে মুনাফিকদের অপকর্ম	১৬৭
ফরজ হজ পালন	১৬৭
বিদায় হজ	১৬৮
আখেরাতের সফর	১৭০
উসামা বাহিনীর প্রস্তুতি	১৭১
শেষ ভাষণ	১৭১
'কিরতাস' এর ঘটনা	১৭১
নবীজির ইন্তেকাল	১৭৩
সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা	১৭৫
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ভাষণ	১৭৬
খেলাফত কেন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ	১৭৬
কাফন, জানাযা ও দাফন	১৭৮
পাঠ সহায়ক গ্রন্থ	১৭৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল ও বৈশিষ্ট্যাবলি	
নবীজির আকার-অবয়ব	১৮০
তিনি অনুপম ও অদ্বিতীয়	১৮২
চতুর্দশীর চাঁদ	১৮
সবার চেয়ে সুন্দর	১৮২
বরকতময় শরীরের সুঘ্রাণ	১৮৩
বাচন শৈলী	১৮৩
লজ্জাশরম ও শিষ্টাচার	১৮৪
কারো গায়ে হাত তোলেননি	১৮৪
আল্লাহর অবাধ্যতা সহ্য করতেন না	১৮৪
ভৃত্যকে উফ পর্যন্ত বলেননি	১৮৫

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থ সংকলনের প্রেক্ষাপট

ইতিহাস এমন শাস্ত্র, যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া ও যাচাইবাছাই করা জটিল কাজ। এ কারণে মানুষ সাধারণত ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করতে ও ইতিহাস পাঠ করতে বিরক্তিবোধ করে; অথচ মূলনীতি মেনে ইতিহাস পাঠ করলে অপরিসীম উপকার পাওয়া যায়। শতাব্দীর অভিজ্ঞতা মাত্র কয়েক পাতায় তুলে ধরে ইতিহাস। অতীতের আয়নায় বর্তমানকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের উত্তম পরিকল্পনা করার যোগ্য বানিয়ে দেয়। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা বন্ধু ও শত্রুর পরিচয় জানতে পারি এবং বিভিন্ন জাতির স্বভাব জেনে সে অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা লাভ করি।

এ কারণে পাশ্চাত্যে অসংখ্য গবেষক ও লেখক ইতিহাস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে তারা তাদের জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে পুরো বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে। অপরদিকে প্রাচ্যবিদদের[১] বড় একটি দল, তাদের প্রশিক্ষিত স্বাধীন চিন্তার স্কলার ও ভ্রান্ত দলের লেখকরা ইসলামি ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ফলে আমরা আমাদের ইতিহাস থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছি। এমনকি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা এসব বিকৃত ইতিহাস পড়ে দীন থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। এর সমাধান এটা নয় যে, আমরা ইতিহাসকে বর্জন করব এবং মানুষকে তা পাঠ করতে নিষেধ করব; বরং এর সমাধান হলো, আমরা গবেষণার আলোকে প্রকৃত ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরব। যাতে বিকৃতি ও ভুল ধারণার অপনোদন হয়।

এ লক্ষ্যে আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছি। গত বারো বছর ধরে ইতিহাস যাচাইবাছাই ও পর্যবেক্ষণের দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। যতটুকু কাজ হয়েছে, তা 'তারীখে উম্মাতে মুসলিমা' নামে বৃহৎ কলেবরে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণ, নবীজির সীরাত, খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে উমাইয়া, খেলাফতে আব্বাসিয়া, উসমানি সাম্রাজ্য ও ইসলামি আন্দালুসের ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। বড় সাইজের বইয়ে প্রায় সাড়ে চার

---

[১] প্রাচ্যবিদ দ্বারা উদ্দেশ্য পাশ্চাত্যের সেসব জ্ঞানী ব্যক্তি, যারা প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ বিশেষত মুসলিম বিশ্বের ইলমি উৎসগ্রন্থসমূহ পাঠ করে বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করে। তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার অধিকারী লোকের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশই ইসলামের ব্যাপারে মারাত্মক বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের গবেষণামূলক কাজ মূলত ইসলামের প্রতি শত্রুতায় পরিপূর্ণ থাকে। বিস্তারিত জানতে অধমের এ দুটি বই পড়া যেতে পারে : 'নাযরিয়াতি জাঙ্গ কে উসুল' ও 'নাযরিয়াতি জাঙ্গ কে মুহায'।

হাজার পৃষ্ঠায় গ্রন্থটি ছেপে এসেছে। উলামা-মাশায়েখ, বিজ্ঞ পণ্ডিত ও মুসলিম জাতির নবজাগরণ নিয়ে কাজ করা সুহৃদগণ গ্রন্থটিকে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। ষষ্ঠ খণ্ড নিয়ে কাজ শুরু করব অচিরেই, যার মধ্যে উপমহাদেশ ও আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসবে।

এর পাশাপাশি ইতিহাসের এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করাও জরুরি ছিল, যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো যাবে এবং যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ হবে। পূর্ণাঙ্গ ও সংক্ষিপ্তও হবে।

গত তিন বছরে একাধিক আকাবির উলামা-মাশায়েখ আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। ২০২১ সালের নভেম্বরে আমি রায়বেন্ডের বার্ষিক ইজতেমায় হাজির হই। সেখানে হিন্দুস্তান থেকে আগত দাওয়াত-তাবলিগের মুরুব্বিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ব্যাঙ্গালোরের শ্রদ্ধেয় ফারুক ভাইয়ের সাথেও দেখা হয়। তিনি জেনারেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

গত বছর 'তারীখে উম্মাতে মুসলিমা'র ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হলে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর মাওলানা যাকারিয়া মাদানী ও অন্য আলেমদের সাথে জামিয়া দারুল উলুম করাচিতে গিয়ে বইটি শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি আলোচনাকালে ইতিহাস বিষয়ক এমন একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, যাকে ধর্মীয় মাদরাসার পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমি এ ব্যাপারে তার কিছু নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা দেন। এরপর আমি এ ওয়াদা করে বিদায় নিই যে, এখন আমি এটা নিয়েই কাজ করব এবং অতি দ্রুত তা সম্পন্ন করব। এরপর ফিরে এসে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। হযরতের নির্দেশনা মাথায় রেখে কাজ করেছি। এ ছাড়া হযরত মাওলানা আবিদ মাদানী (শিক্ষক : জামিয়া খাইরুল মাদারিস, মুলতান) স্নেহবশত অত্যন্ত উপকারী দিকনির্দেশনা দিতে থাকেন। তিনি উভয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পাঠ করে জরুরি সংশোধন ও পরিমার্জনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, এখন এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায়। আশা করি শিক্ষার্থীদের জন্য এর মাধ্যমে ইতিহাস পড়া ও বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ ইসমাইল রাইহান
১ জুমাদাল উলা ১৪৪৫ হি./১৬ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি.

লেখকের আরজ

সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে কুফর-শিরকের ঘোর অন্ধকারে ইসলামের আলো প্রজ্বলিত হয়। খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নবীজি ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করেন। সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আশপাশে জড়ো হন। নবীজিকে মক্কা থেকে বের হতে বাধ্য করা হলে মদিনার আনসাররা তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেন। মদিনায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদ চলতে থাকে। দশ বছরের মধ্যে পুরো আরবে তাওহিদের কালিমা ধ্বনিত হতে থাকে। এরপর মক্কা বিজিত হয়। লাত-উযযার মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মুসলমানরা জাযিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে কায়সার-কিসরার শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। শত শত বছর ধরে জুলুম-নির্যাতনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানবতাকে মুক্তি দিয়ে তাদের কপালকে প্রকৃত রবের সামনে নত করার স্বাধীনতা দেয়। কয়েক দশকের মধ্যে এত সুন্দর একটি সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যা নিয়ে মানবতা গর্ব করবে কেয়ামত পর্যন্ত।

বিজয় ধারার পর অভ্যন্তরীণ ফেতনা মাথাচাড়া দেয়। এটা ছিল মুসলিম জাতির ইতিহাসে প্রথম ফেতনার যুগ। যার সময়কাল ছিল ৩৪ হি. থেকে ৪০ হি. পর্যন্ত প্রায় সাত বছর। বাহ্যিকভাবে ফেতনার সূচনা ৩৪ হি.-তে হলেও এর গোড়াপত্তন হয় আরো আগে। এই ফেতনার ফলে উসমান রা.-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যা পুরো উম্মতকে হতবাক করে দেয়।

আলী রা.-এর শাসনামলেও ফেতনাবাজরা তৎপর থাকে। এ সময় আমাদের ইতিহাসের আরো দুটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে : 'জঙ্গে জামাল' ও 'জঙ্গে সিফফিন'। যে যুদ্ধে প্রথমবারের মতো মুহাম্মাদি উম্মত পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করে।

এই ঘটনায় চারটি পক্ষ ছিল। একপক্ষ আলী রা.-এর সঙ্গীরা; আরেক পক্ষ তার বিরোধীরা; তৃতীয় পক্ষ নিরপেক্ষ সাহাবিরা এবং চতুর্থ পক্ষ যারা পর্দার আড়ালে থেকে যুদ্ধের আগুন উসকে দিচ্ছিল। এটা ছিল যুদ্ধবিগ্রহের যুগ। এমন সময়ে প্রকৃত সংবাদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি জোর থাকে গুজবের। সাধারণত শত্রুপক্ষ এগুলোকে চাউর করে দিত। সুতরাং এই যুগের ব্যাপারে প্রকৃত সংবাদের তুলনায় বেশি প্রসিদ্ধি ঘটে গুজব ও মিথ্যা বর্ণনার। পরবর্তী কালে এগুলোও ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। বেশির ভাগ বর্ণনা সাহাবিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবাস্তব ও বিকৃত রূপ তুলে ধরে। এজন্য জরুরি হলো, এই যুগের ইতিহাসকে অতিরিক্ত সতর্কতা ও

গুরুত্বের সাথে পাঠ করা এবং রিজাল শাস্ত্রের আলোকে সন্দেহযুক্ত বর্ণনার যাচাইবাছাই করা।

মুআবিয়া রা.-এর ইন্তেকালের পর রজব ৬০ হি. থেকে ৭৩ হি. পর্যন্ত কারবালার যুদ্ধ, হাররার ঘটনা, মক্কা-মদিনার ওপর শামের সেনাবাহিনীর আক্রমণসহ বেশ কয়েকটি নাজুক অধ্যায় সামনে আসে। এসব ঘটনার ইতিহাসেও দুর্বল ও বানোয়াট বর্ণনার স্তূপ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সঠিক উৎস নির্বাচন ও বাস্তবতা যাচাই করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় ও অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এসব গবেষণার জন্য আমাকে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সহস্রাধিক বই ঘাঁটতে হয়েছে। ইতিহাসবিদদের মধ্যে ইবনে জারির তবারী, বালাযুরী, খলিফা বিন খাইয়াত, ইবনে আসির জাযারী, হাফেয ইবনে হাজার, আল্লামা ইবনে আবদুল বার, আল্লামা যাহাবী, হাফেয ইবনে কাসির ও আল্লামা ইবনে খালদুনের গ্রন্থ থেকে অধিক পরিমাণে তথ্য নিয়েছি। নিকট যুগে রচিত 'সহিহ ও যয়িফে তবারী' থেকেও অনেক উপকৃত হয়েছি।

এতে সন্দেহ নেই, উসমান রা.-এর শাহাদাত থেকে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর শাহাদাত পর্যন্ত ইতিহাস গভীর পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। 'মুশাজারাতে সাহাবা'-সহ আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত নাজুক বেশ কিছু ঘটনা এ সময়ে ঘটেছিল। এসব ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন দল ও মতবাদের পৃথক বক্তব্য রয়েছে। এ ছাড়া ইতিহাসবিদদের রীতি হলো, তারা ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে থাকেন। এসব কারণে আমাদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে শত শত অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী ঐতিহাসিক উৎসের যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে যে মৌলিক কথা বলেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন :

> 'আমাদের কাছে ইতিহাস শাস্ত্রের যেসব কিতাবের ভান্ডার রয়েছে, সেগুলোতে একই ঘটনার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ইতিহাস শাস্ত্রে কোনো বর্ণনার যাচাইবাছাইয়ের সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি, যা হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ করেছেন। এর ফলে ইতিহাস গ্রন্থে সব ধরনের বিবরণ জায়গা পেয়েছে। সঠিক ও ভুল—দুই রকমই। কোনো বিষয়ে বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য আবশ্যক হলো, সঠিক ও ভুলের এই ভান্ডার থেকে শুধু সেই বর্ণনাগুলো গ্রহণ করা হবে, যেগুলো হাদীস বর্ণনার মূলনীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। 'জারহ-তাদিল' তথা বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের মূলনীতি সম্পর্কে অবগত কোনো আলেম যদি এসব বর্ণনার যাচাইবাছাই করেন, তবে সন্দেহপূর্ণ বর্ণনার বড় একটা অংশ

পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। এর কারণ হলো, উসমান রা.-এর শাসনামলের শেষের দিকে আবদুল্লাহ বিন সাবা যে ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন শুরু করেছিল, তার বড় দুটি উদ্দেশ্য ছিল। ক. সাহাবিদের মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, খ. বানোয়াট বর্ণনা ছড়ানো। তাই তারা অসংখ্য ভুলভাল ঘটনা সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল। মুহাদ্দিসগণ পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করে হাদীস ভান্ডারকে এই সাবায়ি ফেতনার প্রভাব থেকে রক্ষা করেন। তারা সহিহ ও জাল হাদীস চিহ্নিত করে দেন; কিন্তু ইতিহাস শাস্ত্রে এই কাজটি করা যায়নি। ফলে ইতিহাসগ্রন্থে সেসব বর্ণনা চলে আসে, যা সাবায়ি প্রোপাগান্ডায় তৈরি হয়েছিল।

তবে সতর্ক ইতিহাসবিদগণ প্রতিটি বর্ণনার সনদ উল্লেখ করেছেন। এখন সত্য যাচাইকারী গবেষকদের জন্য এ পথ রয়েছে যে, তারা রিজাল শাস্ত্রের সাহায্যে এসব বর্ণনা যাচাই করবেন। যেসব বর্ণনার ব্যাপারে প্রমাণিত হবে—এগুলো সাবায়ি আন্দোলনের কোনো সদস্য থেকে বর্ণিত, সেগুলোকে সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে গ্রহণ করবেন না। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এবং নবীদের পর উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানব হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীসের অসংখ্য অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তাই সাবায়ি প্রোপাগান্ডা আমলে নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনাকে উপেক্ষা করা যাবে না।'[১]

শাইখুল ইসলামের বক্তব্য দ্বারা বোঝা গেল, আমাদের আকাবির ও আসলাফের নিকট ঐতিহাসিক বর্ণনা যাচাই করা ছাড়া সাহাবিগণ ও সেই যুগের মুসলিম সমাজের ব্যাপারে কোনো মত প্রদান করা সম্পূর্ণ ভুল এবং ঐতিহাসিক বর্ণনার এসব উৎস গবেষণা যোগ্য।

এ কারণে আমি সাহাবিদের যুগের বর্ণনাসমূহকে পূর্ণ সতর্কতা ও দায়িত্বের সাথে যাচাই করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি নিজেই রিজাল শাস্ত্রের কিতাব থেকে বর্ণনাকারীদের অবস্থা দেখেছি। শত শত বর্ণনা যাচাই করেছি এবং প্রতিটি বর্ণনাকারীর জীবনী দেখেছি। এ কাজে আকাবির ও উস্তাদগণ, উলামায়ে কেরাম ও বন্ধুবান্ধবের সাথে পরামর্শ ও আলোচনা জারি ছিল। এতে কাজটি সুন্দর করতে সহযোগিতা হয়েছে। আল্লাহ এমন সমস্ত মুখলিস ব্যক্তির চেষ্টাকে কবুল করুন।

মুহাম্মাদ ইসমাইল রাইহান
৩০ মুহাররম ১৪৪৫ হি./১৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রি.

---

[১] ফাতাওয়া উসমানী : ১/১৭৬-১৭৭

ভূমিকা
ইতিহাসের প্রাথমিক আলোচনা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই অধ্যায় পাঠ করে যা জানা যাবে :

১. ইতিহাস শাস্ত্রের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও উপকারিতা।

২. ইতিহাস শাস্ত্র রচনার সূচনা ও উন্নতি।

৩. ইতিহাস শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থকার ও বর্ণনাকারীদের পরিচয়।

৪. গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থের পরিচয় এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও অসম্পূর্ণতা।

৫. ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার মৌলিক নীতিমালা।

ইতিহাস শাস্ত্রের প্রাথমিক আলোচনা

ইতিহাসের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইতিহাসের আরবি হলো, تَارِيْخ। যার আভিধানিক অর্থ : الإعْلَام بِالْوَقْتِ। 'সময় জানানো।' আরবরা বলে থাকে : أرخ زيد الكتاب 'যায়েদ চিঠি লিখে তাতে তারিখ দিয়েছে।'[১]

ইতিহাস শাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো :

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنِ الزَّمَانِ وَأَحْوَالِهِ وَعَنْ أَحْوَالِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حَيْثُ تَعْيِيْنِ ذلِكَ وَتَوْقِيْتِهِ.

'ইতিহাস এমন শাস্ত্র, যাতে সময় নির্ধারণ করে কোনো যুগ, তার অবস্থা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়।'[২]

বিষয়বস্তু

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু হলো, বিগত মানুষ ও গত হওয়া সময়ের বিবরণ। আল্লামা সাখাবী এ কথাটি সংক্ষেপে বলেছেন :

مَوْضُوْعُهُ الْإِنْسَانُ وَالزَّمَانُ.

'ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও যুগ।'[৩]

অর্থাৎ, কোন যুগে মানুষের উপর দিয়ে কেমন ঘটনাপ্রবাহ ঘটে গেছে—একজন ইতিহাসবেত্তা সেই তথ্যের খোঁজে থাকেন। সুতরাং এটিই ইতিহাস শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়।

ইতিহাসের উদ্দেশ্য

ইতিহাস পাঠ ও পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য দুটি :

---

[১] আস সিহাহ তাজুল লুগাহ, আবু নাসর জাওহারী : ১/৪১৮

[২] আল মুখতাসার ফি ইলমিত তারীখ, কাফিজী : ৫৫

[৩] আল ইলান বিত তাওবীখ নিমান যাম্মাত তারীখ, সাখাবী : ১৭

১. মানুষ ও যুগের অবস্থা জেনে শিক্ষা গ্রহণ করা।

২. জাতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা এবং সেগুলোকে সমুন্নত রাখা।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্বভাব-চরিত্র, শিষ্টাচার, সামাজিক রীতি, বিভিন্ন জাতির সাথে সম্পর্ক, অতীতের সাথে সম্পর্ক ও ভবিষ্যতের ভাবনা সবই অন্তর্ভুক্ত।[১]

ইতিহাসের উপকারিতা

ইতিহাস অধ্যয়নের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইতিহাস আমাদেরকে পরিস্থিতির সঠিক পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য বানিয়ে দেয়। কেননা ইতিহাস পাঠকারী অতীতে ঘটা এমন বহু অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে, যা বর্তমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. ইতিহাস মানুষকে অভিজ্ঞ বানায়। একজন সেনাপতি সাধারণ সৈনিক থেকে শক্তিমত্তা ও উদ্যমতার আধিক্যের কারণে ঊর্ধ্বে এজন্য হয় না। শক্তির দিক দিয়ে বহু সৈনিক তার চেয়ে এগিয়ে থাকে। মূল পার্থক্য, অভিজ্ঞতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতায়। ইতিহাস মানুষকে কয়েক ঘণ্টায় শত বছরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞাত বানিয়ে দেয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করে।

৩. ইতিহাস মানুষকে সতর্ক রাখে, সতর্কতার শিক্ষা দেয়। দূরদর্শিতা সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ শেখায়। শত্রুর চক্রান্ত থেকে বাঁচার পদ্ধতি জানায়।

৪. ইতিহাস নিজেদের পূর্বপুরুষদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে জাতীয় আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করে, যা সকল উত্তম গুণাবলির প্রাণ। এর বিপরীতে অশ্লীলতা ও আত্মমর্যাদাহীনতা সকল অনিষ্টের মূল। এই আত্মমর্যাদা না থাকলে মানুষ নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট কাজ করতেও লজ্জা পায় না। কারো যদি নিজের উচ্চবংশীয় হওয়ার অনুভূতি থাকে, তাহলে সে নিজ বংশকে কলঙ্কিত হতে দেয় না।

জাতির সামগ্রিক অন্তরের অবস্থাও এমন। কওমের লোকেরা যদি অবগত থাকে তারা কাদের উত্তরসূরি, তবে কঠিন থেকে কঠিন পরীক্ষাতেও অটল থাকবে; বড় থেকে বড় শক্তির সামনেও মাথানত করবে না। কিন্তু এই অনুভূতিই যদি না থাকে, তবে এমন জাতির ঘরে ঘরে বিশ্বাসঘাতক ও ছোটলোক জন্ম নিতে থাকবে।

৫. ইতিহাস পাঠ না করে আমরা ইহুদি-খ্রিস্টান এবং ইসলামের অন্যান্য শত্রুর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক হতে পারব না।

---

[১] আল ইলান বিত তাওবীখ নিমান যাম্মাত তারীখ, সাখাবী : ৫০ থেকে ৮০

৬. ইতিহাসের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমেই আমরা ভ্রান্ত ফেরকা, সেক্যুলার ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের সে সকল ভ্রান্ত গবেষণার জবাব দিতে পারব, যা তারা ইতিহাসের নামে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে।

৭. নিজ যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য উত্তম সাহচর্য ও বড় মানুষদের সাথে ওঠাবসার চেয়ে বেশি উপকারী কিছুই হতে পারে না। ইতিহাস কোনো কষ্ট ছাড়াই আমাদেরকে কখনো নববী যুগে নিয়ে যায়, কখনো সাহাবি যুগের বসন্ত দেখায়, কখনো শিবলী-জুনাইদ বাগদাদীর মজলিসে বসিয়ে দেয় আর কখনো সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের দরবারে পৌঁছে দেয়।

ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

ইতিহাস শাস্ত্রে সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ঘটনা সাজানো হয়। যে ঘটনা আগে ঘটেছে সেটাকে আগে আনা হয় আর যেটা পরে ঘটেছে সেটাকে পরে। অথবা পৃথক সাম্রাজ্য বা রাজত্বের বিবরণ একসাথে দেওয়া হয়।

সাহিত্যের বইয়ে বা হাদীসের কিতাবে অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এগুলোকে ইতিহাসগ্রন্থ বলা হয় না। কেননা হাদীসে বা সাহিত্যের বইয়ে কালের ধারাবাহিকতা হিসেবে ঘটনা সাজানো হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার সময়কালও উল্লেখ থাকে না। সাহিত্যের বইয়ে ঘটনা উল্লেখ করা দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে, ঘটনাটি যেন সবার সামনে আসে এবং পাঠক তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ বা বিনোদন লাভ করে। হাদীসে ঘটনা উল্লেখ করা হয় ফিকহি বিধান, শরিয়তের আদব, সনদের অবস্থা অথবা বর্ণনাকারীর নামের হিসেবে। ইতিহাসে শাসক ও সাম্রাজ্যের অবস্থা ও বিপ্লবের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ রাখা হয়; কেননা এটাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

মূলনীতি অবলম্বন না করে ইতিহাস পাঠের ক্ষতি

অনেক ইতিহাস পাঠকারী নিজের অতীত সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ও পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. কোনো ভালো বিষয়কে মূলনীতির বিপরীত ব্যবহার করা হলে সেটাও ক্ষতিকর হয়ে যায়। অধিকাংশ লোক ইতিহাস পড়েন ও পড়ান; কিন্তু আলেমদের তৈরিকৃত ইতিহাসের মূলনীতি সম্পর্কে অনবহিত থাকেন। যেকোনো শাস্ত্রকে তার মূলনীতির বিপরীত গ্রহণ করা হলে সেটা বক্রতার জন্ম দেয়।

২. ঐতিহাসিক উৎসসমূহে ভ্রান্ত ফেরকার বর্ণনাকারীরা জায়গায় জায়গায় মনগড়া বর্ণনা ঢুকিয়ে দিয়েছে। যা থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করার কাজ পুরোপুরি হয়নি। দক্ষ ও বিজ্ঞ আলেমরাই এমন তথ্য ধরতে পারবেন। অল্প জ্ঞানের অধিকারী সাধারণ পাঠক এই সকল বর্ণনা বিশ্বাস করে বিভ্রান্তির শিকার হয়।

৩. ইতিহাস হলো ঘটনাপ্রবাহের সমষ্টি। অনেক সময় কিছু ঘটনার প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা উল্লেখ থাকে না। এর ফলে বহু ভুল ধারণা জন্ম নিতে পারে। কখনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। আবার কখনো কারো প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতা থাকার দরুন সন্দেহযুক্ত বর্ণনাকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৪. আমাদের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ আরবি-ফারসি না জানার কারণে ইতিহাসের মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন না। উর্দু বা ইংরেজি অনুবাদের ওপর ভরসা করেন। এতে জ্ঞানের গভীরতা অর্জিত হয় না।

৫. ইংরেজি বই পাঠের অভ্যাসের কারণে ইতিহাসের অধিকাংশ প্রফেসর ও ডক্টর প্রাচ্যবিদদের বই অধ্যয়ন করেন। যেসব বই গবেষণার আড়ালে চিন্তাগত বিষে ভরপুর হয়ে থাকে।

৬. অনেকে রিজাল শাস্ত্রের ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের বর্ণনাকেও অকাট্য মনে করে।

৭. কিছু লোক বর্ণনা শাস্ত্রের ব্যাপারে অজ্ঞতার দরুন কোনো বর্ণনায় সন্দেহমূলক কোনো তথ্য পেলে রাবী সম্পর্কে কঠিন মত প্রদান করে বসে। অনেকে তো সীরাত ও ইতিহাসের মৌলিক কিছু উৎসকে মুনাফিক ও অগ্নিপূজারিদের কল্পকাহিনি আখ্যা দেয় আর অনেকে এ ধরনের তথ্য হাদীসের ভান্ডারে পেয়ে হাদীস অস্বীকার করে বসে।

ইতিহাসের এ সকল ধ্বংসাত্মক বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে বিখ্যাত মিশরি আলেম শায়খ আলী তানতাবী বলেন : 'ঐতিহাসিকদের বর্ণনা সাধারণ পর্যায়ের হয়। পুরোপুরি মানোত্তীর্ণ বর্ণনা মুহাদ্দিসদের হয়ে থাকে। এ কারণে আমাদের ইতিহাসের প্রথম উৎস হলো, মুহাদ্দিসদের বর্ণনা। যে ব্যক্তি মুহাদ্দিসদের পরিভাষা ও জ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত হবে, তাকে ইতিহাসবিদ গণ্য করা যাবে না।'

তিনি আরো লেখেন : 'যে বিশ্লেষক আলোচনার শেষে তবারীর পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করে, সে যেন এ কথা প্রকাশ করছে যে, সে আঁধার

রাতে অনুমানে ঢিল ছুড়তে অভ্যস্ত। সে জানে না, ইতিহাসগ্রন্থ থেকে কী গ্রহণ করতে হয় আর কী বর্জন করতে হয়। মুসলিম ঐতিহাসিক বা ইসলামি ইতিহাসের শিক্ষক তিনিই হতে পারবেন, যিনি রিজাল শাস্ত্রের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন, হাদীস শাস্ত্র ও তার মূলনীতি সম্পর্কে অবগত থাকেন, আরবি ভাষায় দক্ষ হন, আরবি ভাষার বাহ্যিক ও গূঢ় অর্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন, আরবি ভাষার ইঙ্গিতমূলক বাক্য বুঝতে পারেন। যিনি স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত এবং সততা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারী হবেন।

এই গুণাবলির অধিকারী না হলে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, বরং ধোঁকাবাজ গণ্য হবেন; তিনি কোনো ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের শিক্ষক বা বড় বড় ডিগ্রির অধিকারী হলেও। কেননা, সরকারি প্রতিষ্ঠান তো যেকোনো ব্যক্তিকে ডিগ্রি দেখে শিক্ষক নিযুক্ত করে আর এমন ডিগ্রি টাকা দিয়ে বা নকল করেও লাভ করা যায়; কিন্তু কোনো সরকারের এ অধিকার নেই যে, মূর্খকে জ্ঞানী বানিয়ে দেবে, পক্ষপাতীকে পবিত্র আর মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বানিয়ে দেবে।'[১]

[১] কাসাসুম মিনাত তারীখ, আলী তানতাবী : ১৩-১৪ ভূমিকা।

ইতিহাস শাস্ত্রের ইতিহাস

ইতিহাস রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা প্রাচীন রোমান, গ্রিস, চীন, শাম, মিশর ও হিন্দুস্তানের সভ্যতায় পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালের লোকেরা যখন লেখাপড়া জানত না, তখনো তারা অতীতের বিশেষত পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিল। মায়েরা তাদের সন্তানদের অতীতের বীর-বাহাদুর ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের গল্প শুনিয়ে দীক্ষা দিত। সম্প্রদায় বা গোত্রের ইতিহাস সংরক্ষণের প্রসিদ্ধ পদ্ধতি ছিল কাব্যচর্চা। কবিরা বিভিন্ন সভায় অতীতের কাহিনি কাব্য আকারে উপস্থাপন করত। মেধাবী লোকেরা তা মুখস্থ করে ফেলত। কবিতাগুলো বংশপরম্পরায় চর্চা ও সংরক্ষণ হতো। সাধারণত এসব কবিতায় জাতির বীরদের কীর্তিগাথা বর্ণনা করা হতো। ইতিহাসের প্রাচীন চীনা ও আরব উৎস কাব্য আকারেই পাওয়া যায়। বেদুইন ও অনগ্রসর এলাকায় আজও এ পদ্ধতি প্রচলিত।

লেখাপড়ার কিছুটা উন্নতি হলে উন্নত কিছু রাষ্ট্রে শাসকদের ইঙ্গিতে ইতিহাসের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে। ধর্মীয় বই ও আসমানি সহিফায়ও বিভিন্ন গোত্রের কিছু অবস্থা সংরক্ষিত হয়।

কবিতা বাদে সে যুগের ঐতিহাসিক উৎসসমূহের মধ্যে বাইবেল তথা পুরোনো ও নতুন আহদনামা, ভগবত গীতা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। অনেক বিকৃতি থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন যুগের অবস্থা জানার জন্য এগুলোকে মৌলিক উৎস ধরা হয়। এই যুগকে নিয়ম অনুযায়ী ইতিহাস রচনার যুগ বলা যায় না। তবে এ যুগের উৎসসমূহের গুরুত্ব পরবর্তী কালে অনেক বেড়ে যায়। কেননা, প্রাচীন যুগের মানুষের অবস্থা জানার অন্য কোনো মাধ্যম নেই।

রোম ও গ্রিসের ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ বছর এবং তার পরবর্তী সময়ের ইতিহাস সংরক্ষিত আছে ধরা হয়। কেননা, এটি ছিল গ্রিসের বিজ্ঞ দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের যুগ। তখন ইউরোপে লেখাপড়ার প্রচলন শুরু হয়েছিল। এজন্য আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, জুলিয়াস সিজার ও হ্যানিবলের মতো রাজাদের জীবনীর বড় অংশ তাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। এটা ভিন্ন বিষয় যে, তাদের ইতিহাস সূত্রবিহীন।

ইউরোপে ইতিহাস রচনার এত উন্নতি সত্ত্বেও প্রাচ্যে বহু দিন পর্যন্ত অন্ধকার ছেয়ে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ বছর পর্যন্ত হিন্দুস্তানের ইতিহাস অন্ধকার। সম্রাট অশোক ও

গৌতম বুদ্ধের ব্যাপারে কিছু কবিতা ও ভিত্তিহীন কাহিনি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

ইতিহাস রচনার রীতি এক ধাপ আগে বাড়ে সে সময়, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন কওমে লেখাপড়ার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঘটনা লিপিবদ্ধ করার সূচনা হয়। কিছু ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লিপিবদ্ধ করে শাসকের কাছে পাঠাত। তাদের রোজনামচার রেকর্ড থেকে অতীতের ইতিহাস তুলে আনতে ইতিহাসবিদদের অনেক সহায়তা হয়েছে।

ক্যালেন্ডার প্রবর্তন

কোনো ঘটনা মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হলো, সেটাকে বড় কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা, যা সবাই জানে। আদি যুগে সবার মাঝেই এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কেননা, তখন ক্যালেন্ডারের প্রচলন ছিল না। মানুষ প্রসিদ্ধ ঘটনার মাধ্যমে তারিখ অনুমান করে নিত।

আল্লামা সুয়ুতী রহ. বলেন, প্রথমে মানুষ আদম আ.-এর দুনিয়ায় অবতরণের তারিখের হিসাব করত। নুহ আ.-এর তুফানে সকল সৃষ্টিজীব ধ্বংস হয়ে গেলে বেঁচে যাওয়া লোকেরা এই ঘটনা থেকে তারিখের হিসাব রাখা শুরু করে।

নুহ আ.-এর সন্তানরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর প্রত্যেকে নিজেদের পদ্ধতিতে তারিখ মনে রাখতে আরম্ভ করে। আরবরা ইবরাহিম আ.-এর আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা থেকে হিসাব রাখে। ইসহাক আ.-এর বংশধর তথা ইহুদিরা বছরের হিসাব রাখার জন্য ইউসুফ আ. থেকে মুসা আ. পর্যন্ত, এরপর মুসা আ. থেকে সুলাইমান আ. পর্যন্ত, তারপর সুলাইমান আ. থেকে ঈসা আ. পর্যন্ত সময়ের হিসাব করে। ইসমাইল আ.-এর বংশধররা কাবা নির্মাণের সময় থেকে তারিখের হিসাব করতে থাকে। পরবর্তী কালের লোকেরা কাব বিন লুওয়াইয়ের ইন্তেকাল থেকে নতুন হিসাব রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কুরাইশরা হাতির বছর থেকে তারিখ হিসাব করে। পরবর্তী কালে মুসলমানরা নবীজির হিজরত থেকে হি. সনের হিসাব শুরু করেন।

অপরদিকে রোমানরা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের যুগ থেকে তারিখ হিসাব শুরু করে। পারস্যের অধিবাসীরা নিজেদের প্রত্যেক বাদশাহর মসনদে আসীন হওয়ার সময় থেকে বছরের হিসাব করত।

ক্যালেন্ডারের সূচনা ইতিহাস রচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় নিজেদের ক্যালেন্ডার চালু করেছে। কিন্তু মাত্র দুটি

ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি ও সেগুলোর রচয়িতা

মুসলিম জাতির ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি উপকারী ও সর্বজনস্বীকৃত রচনা হলো :

১. তারীখে খলিফা বিন খাইয়াত ২. তারীখে তবারী ৩. আল কামিল ফিত তারীখ ৪. তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬. তারীখে ইবনে খালদুন ৭. তারীখুল খোলাফা।

এই গ্রন্থগুলো এবং রচয়িতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

১. তারীখে খলিফা বিন খাইয়াত

এটি ইমাম খলিফা বিন খাইয়াত (মৃত্যু : ২৪০ হি.)-এর সংকলন। তিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ। এটিকে মুসলমানদের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস মনে করা হয়। এই গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে খলিফা মুতাওয়াক্কিল আব্বাসির যুগ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো, বছরের ধারাবাহিকতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখা হয়েছে এবং বর্ণনাশৈলীতে সংক্ষিপ্ততা রয়েছে। অধিকাংশ বর্ণনা নেওয়া হয়েছে নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে।

২. তারীখে তবারী

এর মূল নাম 'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক'। এর লেখক আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির বিন ইয়াযিদ আত তবারী রহ.। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মহান ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ। এই নামে একজন শিয়া ইতিহাসবিদ আছে আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির বিন রুস্তম আত তবারী। নামের মিল থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়। সুন্নি তবারীকে অনেকে শিয়া মনে করে থাকে।

ইমাম তবারী রহ. ২২৫ হি.-তে তবরস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। মিশর, শাম ও অন্যান্য শহরের শায়খদের থেকে হাদীস, কেরাত ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর বাগদাদ এসে হাদীসের দরস, ফতোয়া লিখন ও লেখালেখির কাজ আরম্ভ

করেন। পরবর্তী কালে পুরোপুরি লেখালেখিতে মশগুল হন এবং অসংখ্য উপকারী গ্রন্থ রচনা করেন। ৩১০ হি.-তে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম তবারী রহ. এ গ্রন্থে নবীদের থেকে শুরু করে ৩০২ হি. পর্যন্ত ইতিহাস এনেছেন। এর মধ্যে নবীজির যুগ, খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে বনু উমাইয়া এবং খেলাফতে বনু আব্বাসের প্রথম আট দশকের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ পরবর্তী কালের সকল ইসলামি ইতিহাসের মৌলিক উৎস।

তারীখে তবারীর কিছু বৈশিষ্ট্য

১. এতে প্রতিটি বর্ণনার সনদ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে আলেমরা এর অবস্থান অনুমান করতে পারেন।
২. লেখক নিজে অনেক বড় ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। এজন্য অন্য কোনো ঐতিহাসিক থেকে তার ওপর বেশি আস্থা রাখা যায়।
৩. লেখক উৎস থেকে হুবহু বর্ণনা এনেছেন, কোনো ধরনের পরিবর্তন করেননি। ফলে তবারীর পাঠক যেন আগের যুগের ইতিহাস-ই হুবহু পাঠ করে।

দুর্বলতা

ইমাম তবারী বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে কোনো ধরনের মন্তব্য ছাড়াই এতে ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। রাবীদের ব্যাপারেও আলোচনা করেননি, কোনো বর্ণনার ব্যাখ্যাও দেননি। এ কারণে অনেক সময় এ ভুল ধারণা তৈরি হয় যে, লেখক সব ধরনের বর্ণনার সাথে একমত। এ ছাড়া একই নামে আরেকজন শিয়া ইতিহাসবিদ (যার ইতিহাসগ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা পূর্ণ বহু বর্ণনা রয়েছে) থাকায় তবারী রহ.-এর ব্যাপারে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি শিয়া মতাবলম্বী। ফলে তার ওপর এ অভিযোগও করা হয়েছে যে, তিনি শিয়াদের জন্য বানোয়াট বর্ণনা উল্লেখ করেন; কিন্তু এ অভিযোগ সঠিক নয়। হাফেয যাহাবী রহ. এ অপবাদের জবাব দিতে গিয়ে বলেন :

> هذا رجم بالظن الكاذب، بل إبن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين.
>
> ‘এটা কেবলই ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধারণা। ইবনে জারির তো ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইমামদের একজন।’[১]

[১] মিযানুল ইতিদাল : ৩/৪৯৯

তারীখে তবারীতে এমন কিছু অনুপযুক্ত বর্ণনা রয়েছে, যা দ্বারা ভ্রান্ত ফেরকার লোকেরা দলিল দিয়ে আপত্তি তোলে। এর জবাবে স্বয়ং ইমাম তবারী রহ. কিতাবটির ভূমিকায় লেখেন : 'আমার এ কিতাবে এমন কোনো বর্ণনা যদি পাওয়া যায়, যা পড়ে পাঠক বিস্ময়কর মনে করে বা অপছন্দ করে সেটা সঠিক হওয়ার যুক্তি বুঝে না আসার কারণে, তবে বুঝে নিতে হবে, এমন বর্ণনা আমাদের বানানো নয়; বরং তা বর্ণনাকারীদের থেকে আমাদের কাছে এভাবে পৌঁছেছে আর আমরা সেভাবেই তা উল্লেখ করেছি।'[১]

এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো, লেখক বর্ণনা সঠিক বা ভুল হওয়ার দায়িত্ব নেননি। তিনি সব ধরনের বর্ণনা জমা করে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ পাঠক ও পরবর্তী যুগের আলেমদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাদেরকে এখান থেকে সঠিক-ভুল যাচাই করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। ভিন্নভাবে বললে, ইমাম তবারী 'তারীখ বির রিওয়ায়াহ' (বর্ণনার মাধ্যমে ইতিহাস রচনা) করেছেন। সে যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসের রীতি ছিল, তারা বর্ণনা উল্লেখ করে দিতেন; দলিল পেশ করতেন না।

পরবর্তী যুগের লোকেরা যেন বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে পারে, সেজন্য ইমাম তবারী রহ. প্রতিটি বর্ণনার সনদ উল্লেখ করে দিয়েছেন। এখান থেকে বর্ণনাকারীদের অবস্থা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে—কোন বর্ণনা কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং ইমাম তবারী রহ. বা অন্য মহান আলেমদের সংকলিত ইতিহাসে এমন দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা চলে আসার অর্থ এই নয় যে, তারা এগুলোর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার বিরুদ্ধে দলিল পেশ করছেন অথবা তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ভুল দলিল দিতে উৎসাহিত করা।

৩. আল কামিল ফিত তারীখ

এটি আল্লামা মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আসির জাযারী রহ.-এর সংকলন। তিনি ৫৫৫ হি.-তে মুসেলের নিকটবর্তী ইবনে উমর দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলম অর্জনের জন্য ইরাক, শাম ও আল কুদস সফর করেন। অবশেষে মুসেল ফিরে এসে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই লেখালেখির কাজে লিপ্ত থাকেন। ৬৩০ হি.-তে নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

---

[১] তারীখে তবারী : ১/৭-৮

ইতিহাস রচনার উৎস

ঐতিহাসিক তথ্য সর্বদা চার প্রকার উৎস থেকে নেওয়া হয় :

১. সরাসরি প্রত্যক্ষকরণ। ২. একজন থেকে আরেকজনের বর্ণনা। ৩. লিপিবদ্ধ উৎস। ৪. প্রাচীন স্থাপত্য ও নিদর্শন।

প্রত্যক্ষদর্শী

ইতিহাসবিদ নিজ জীবনের চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা। যেমন মোগল সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন বাবর লিখিত 'তুযকে বাবরি', আফগানিস্তানের শাসক আমির আবদুর রহমান রচিত 'তাজুত তাওয়ারীখ' তাদের দেখার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনাকে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য গণ্য করা হয়। শর্ত হলো, এগুলো সমকালীন অন্যান্য ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত বর্ণনা এবং অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া।

একজন থেকে আরেকজনের বর্ণনা

এমন উৎস, যা ইতিহাসবিদ তার যুগের লোকদের থেকে শুনেছেন। তাদের মধ্যে রাজদরবারের পারিষদ, শাসক, দূত, আলেম, সেনাবাহিনীর অফিসার, সৈন্য, ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং এমন সাধারণ মানুষও অন্তর্ভুক্ত, যারা বর্তমান পরিস্থিতি বা নিকট অতীত সম্পর্কে সরাসরি অবগত এবং তাদের ওপর আস্থা পোষণ করা যায়।

লিপিবদ্ধ উৎস

ইতিহাসবিদ সকল ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নন এবং প্রতিটি তথ্য কারো কাছে শোনাও কঠিন। অতীতের ঘটনা তিনি অন্যান্য মাধ্যম থেকে নিয়ে থাকেন। এ মাধ্যম লেখা আকারে থাকলে তাকে লিপিবদ্ধ উৎস বলা হয়। এতে চিঠিপত্র, ফরমান, রশিদ, অঙ্গীকারনামা, সরকারি রেকর্ড ও সব ধরনের লিখিত উৎস অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমার কারণে অতীতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার অন্য কোনো মাধ্যম বাকি থাকে না, এ অবস্থায় অতীতের ইতিহাসগ্রন্থ থেকেই উপকৃত হওয়া সম্ভব।

প্রাচীন নিদর্শন

ইতিহাস বোঝা ও তাতে গভীরতা অর্জনের জন্য প্রাচীন নিদর্শনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীন এলাকা, পুরোনো কেল্লা, মসজিদ, কূপ, ধ্বংসাবশেষ, মাজার ও গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত। তেমনি সেই পাহাড়, উপত্যকা ও ময়দানও ইতিহাসবিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। খননের মাধ্যমে বের হওয়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন (প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব)-ও গুরুত্ববহ। যেমন : অস্ত্র, পাত্র, মুদ্রা। মহেঞ্জোদারো (Mohenjo-daro), হরপ্পা ও তক্ষশীলা (Taxila)-এর ধ্বংসাবশেষ থেকে বের হওয়া বস্তু দেখে আমরা আদিকালের মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ভালোভাবে বুঝতে পারি।

মৌলিক ঐতিহাসিক উৎস প্রয়োজনমতো থাকলেই কেবল প্রাচীন নিদর্শন থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়া যাবে। তখন সেটাকে ভিত্তি বানিয়ে প্রাচীন নিদর্শন থেকে শাখা-প্রশাখা ও বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানা যাবে অথবা কোনো ঘটনার আরো প্রমাণ পাওয়া যাবে বা একাধিক সম্ভাবনার মধ্যে একটাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে। ইতিহাসগ্রন্থ বাদ দিয়ে শুধু প্রাচীন নিদর্শনের মাধ্যমে কোনো ঘটনাকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। সুতরাং কেউ যদি প্রাচীন নিদর্শনের প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎসকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইতিহাস রচনার ধারা

ইতিহাস রচনার তিনটি ধারা রয়েছে :

১. বর্ণনার মাধ্যমে ইতিহাস রচনা

এ ধারায় বর্ণনাসমূহকে হুবহু উল্লেখ করা হয়। ইতিহাস রচয়িতা নিজের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বা মত প্রদান করেন না। রচয়িতার অবস্থান কেবল উদ্ধৃতকারীর পর্যায়ে। ঘটনা থেকে ফলাফল বের করা পাঠকের কাজ। প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ যেমন, *তবাকাতে ইবনে সাদ, তারীখে তবারী, আনসাবুল আশরাফ, ফুতুহুল বুলদান* প্রভৃতি এ ধারার।

২. দিরায়াতের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা

এতে ইতিহাসবিদ কিছু বর্ণনা বা প্রমাণাদি নিয়ে কোনো ঘটনার পরম্পরা সাজিয়ে থাকেন। প্রাচীন নিদর্শন, অন্যান্য প্রমাণাদি ও যুক্তির মাধ্যমে ইতিহাস সংকলন করেন।

৩. বর্ণনা ও যুক্তির মাধ্যমে ইতিহাস রচনা

এর অর্থ হলো, বর্ণনা ও যৌক্তিক সম্ভাবনাকে একসাথে রেখে ইতিহাস রচনা করা। মূলভিত্তি থাকবে ঐতিহাসিক বর্ণনা, তবে বানোয়াট বিষয় ও তথ্য নেওয়া যাবে না। ঘটনাবলির বাস্তবতার নিকটবর্তী ও পক্ষপাতিত্ব বিহীন ব্যাখ্যা করা হবে। এটি ইতিহাস রচনার সবচেয়ে উত্তম ধারা।

ঘটনাবলির যৌক্তিক বিন্যাস

ঘটনা, পরিস্থিতি ও বিপ্লব যত অসাধারণ হয়, এর অনুঘটকও সেই পরিমাণ বিশেষ হয়। আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বকে উপকরণের জগৎ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দুয়েকটা বিরল ঘটনা বাদে এটা সুনিশ্চিত, প্রতিটি কাজ ও ঘটনা পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার প্রভাবেই হয়ে থাকে। তারপর এই ঘটনাটাও পরে অন্য কোনো ঘটনার কারণ হয়। ঘটনাবলির মধ্যে এই সম্পর্ককে 'যৌক্তিক সম্পর্ক' বলা হয়। একে সামনে আনা ইতিহাস রচয়িতার জন্য জরুরি। ইতিহাস যদি এই যৌক্তিক সম্পর্কশূন্য হয়, তবে সেটা শিক্ষণীয় হওয়ার পরিবর্তে ধাঁধার মতো মানসিক অস্থিরতা তৈরি করবে। যৌক্তিক বিন্যাস ঠিক রাখার জন্য দুর্বল বর্ণনা থেকেও তথ্য নিতে হয়।

সাংবাদিকতার ছয়টি মৌলিক প্রশ্ন

যৌক্তিক সম্পর্ক তখনই স্পষ্ট হয়, যখন ঐতিহাসিক ঘটনা সাংবাদিকতার মাপকাঠিতে পুরোপুরি উতরে যায়। সাংবাদিকতার প্রথম শর্ত, বিষয়টি উল্লেখযোগ্য হওয়া। কেউ যদি বলে, 'আজ ব্যবসায়ীরা দোকান খুলেছে'—তবে এটা কোনো সংবাদ নয়; কিন্তু যদি তথ্য পাওয়া যায়, 'আজ পুরো শহরে কেউ দোকান খুলেনি'—তবে এটি সংবাদ। অসংখ্য তথ্য ও সংবাদের মধ্যে যেসব বিষয় সংবাদের মাপকাঠিতে টিকে যায়, তার সমষ্টি দিয়েই সংবাদ সমগ্র বা পত্রিকা তৈরি হয়। কিছুদিন পর পত্রিকার সমষ্টি দিয়ে ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাস যদি সাংবাদিকতার দাবি পূরণ না করে, তবে সেটাকে ইতিহাস বলা যায় না।

সাংবাদিকতার দাবি হলো, প্রতিটি ঘটনায় ছয়টি প্রশ্নের উত্তর সামনে আনতে হবে। কী? কেন? কীভাবে? কোথায়? কে? কখন? অর্থাৎ কী হয়েছে? কেন হয়েছে? কীভাবে হয়েছে? কোথায় হয়েছে? কে করেছে? কখন করেছে?

'কী হয়েছে?'—এর উত্তরে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকতে হবে অর্থাৎ নতুন কোনো

ঐতিহাসিক বর্ণনাবলির বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক বর্ণনা শুধু পড়াই যথেষ্ট নয়, বরং আলেমদের দায়িত্ব হলো, অন্যান্য শাস্ত্রের মতো এখানেও তাহকিক ও গবেষণা করা। যেন এই শাস্ত্রের মান উন্নত থেকে উন্নততর হয় এবং ইতিহাসের পাঠক বিভ্রান্তির শিকার না হয়।

আদালাতে সাহাবা ও ঐতিহাসিক বর্ণনা

ইতিহাস অধ্যয়নের সময় এমন কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়, যা সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা ও অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। এজন্য সাহাবিদের মর্যাদা বোঝা ও তা সামনে রাখা জরুরি।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে সঠিক আকিদাকে এককথায় 'আদালাতে সাহাবা' বলা হয়। ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় 'আদালাত' এমন গুণের নাম, হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে যা থাকা জরুরি। কেননা, নবীজির শিক্ষা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যেমন ন্যায়পরায়ণ হওয়া জরুরি, তেমনি হাদীস সংরক্ষণ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য এ শর্ত দেওয়া হয়েছে। ফাসেক ও পাপী ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সাহাবিদের আমানত ও বিশ্বস্ততা, তাকওয়া ও খোদাভীরুতা, সঠিক পথ প্রাপ্তি ও মর্যাদার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এজন্য তাদের 'আদালাত' অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কুরআন বলে :

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

'তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।'[১]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

'তারা এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন।'[২]

মানুষ হিসেবে কখনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে আল্লাহ তা মাফ করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

---

[১] সূরা হুজুরাত : ৭
[২] সূরা হুজুরাত : ৩

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

'আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ মোচন করব।'[১]

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে :

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'[২]

সাহাবিরা নিষ্পাপ নন, গুনাহ থেকে নিরাপদ

মনে রাখতে হবে, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন, তবে গুনাহ থেকে নিরাপদ ও ক্ষমাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ তাদের থেকে কোনো গুনাহ বা ভুল প্রকাশিত হলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন এবং পরকালীন শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখেন। যেমনটা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা এটি নয় যে, সাহাবিদের প্রত্যেকে ছোট-বড় সকল গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন; বরং তাদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তবে তাদের মর্যাদা এত বেশি যে, কোনো গুনাহ করে ফেললেও এই মর্যাদা তাদের ক্ষমার কারণ হয়ে যায়।'[৩]

হযরত মুফতি তাকী উসমানী সাহেব আদালাতে সাহাবার সঠিক মর্ম বর্ণনা করে বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপও নন, ফাসেকও নন। হতে পারে, মানুষ হিসেবে তাদের কেউ কয়েকবার এক-দুটি ভুল করে ফেলেছেন। তবে সতর্ক করার পর তারা তাওবা করে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এজন্য তারা এসব ভুলের কারণে ফাসেক নন। তাই এটা বলা যাবে না, কোনো সাহাবি গুনাহ করাকে নিজের পলিসি বানিয়ে নিয়েছেন, যার ফলে তাকে ফাসেক আখ্যা দেওয়া যাবে।'[৪]

কথাটা আমরা এভাবে বলতে পারি, সাহাবিরা পাপের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে নিরাপদ। কখনো কেউ গুনাহ করে ফেললে তিনি সেটার ওপর স্থির থাকেননি; বরং তাওবা করে নিজ রবকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত তারা শান্তি পেতেন না।

---

[১] সূরা আলে ইমরান : ১৯৫
[২] সূরা বায়্যিনাহ : ৮
[৩] শরহুল আকিদাতিল ওয়াসিতিয়া : ২৫১
[৪] হযরত মুআবিয়া আওর তারীখি হাকায়িক : ১৩০

প্রথম অধ্যায়
নবীজির সীরাত

এতে তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে :
প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্ববর্তী নবীগণ ও বিগত জাতিসমূহ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামপূর্ব পৃথিবীর অবস্থা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শেষ নবীর জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ
পূর্ববর্তী নবীগণ ও বিগত জাতিসমূহ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

এই পরিচ্ছেদ পাঠ করে নিম্নের বিষয়গুলো জানা যাবে :

* মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানুষ ও শয়তানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বুঝে আসবে।
* বিশিষ্ট নবীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে।
* অতীতের জাতিসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে জানা যাবে।
* প্রাচীন রাজত্ব সমূহের প্রয়োজনীয় বিবরণ তুলে ধরা হবে।

পৃথিবীর সূচনা ও আদম আ.-কে সৃষ্টি

এ বিতর্ক অনেক আগে থেকেই চলছে যে, পৃথিবী কবে সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের অস্তিত্ব কখন থেকে হয়েছে? বর্তমান যুগের দক্ষ ভূতত্ত্ববিদরা (জিয়োলজিস্ট) জমিনের অস্তিত্ব কোটি কোটি বছর আগের এবং মানুষের অস্তিত্ব লাখো বছর আগের বলে; কিন্তু এটি অনুমান মাত্র, কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা একে সমর্থন করে না। উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী রহ. পৃথিবীর সূচনা সম্পর্কে জ্ঞানীদের মতভেদ উল্লেখ করে এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, সৃষ্টির সূচনা হয়েছে ছয় হাজার বছর আগে। তবে তিনি এ কথাও লিখেছেন :

> ‘এ বিষয়টির সর্বশেষ সমাধান বের করা কঠিন। কেননা, এ বিষয়ে অবগত হওয়ার মাধ্যম খুবই কম। যতটুকু আছে তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রাচীন নিদর্শন দ্বারাও নিশ্চিত ফয়সালা করা যায় না। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত, পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে চীনা, হিন্দুস্তানি ও মিশরি জাতি সবচেয়ে প্রাচীন। ইংরেজ ইতিহাসবিদদের দাবি হলো, ভূপৃষ্ঠে এ সকল জাতির অস্তিত্ব প্রায় ছয় ও দশ হাজার বছরের মধ্যে প্রমাণিত। এ কথাও স্বীকৃত, যথাযথ গবেষণা করার পরেও কোনো জাতির সাত হাজার বছরের আগের ইতিহাস পাওয়া যায়নি।’[১]

হাফেয ইবনে আসাকির রহ. এ ব্যাপারে একাধিক মত উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজ সনদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করেন, আদম আ. থেকে নুহ আ. পর্যন্ত ১২০০ বছর, নুহ আ. থেকে ইবরাহিম আ. পর্যন্ত ১১৪২ বছর, ইবরাহিম আ. থেকে মুসা আ. পর্যন্ত ৫৬৫ বছর, মুসা আ. থেকে দাউদ আ. পর্যন্ত ৫৬৯ বছর, দাউদ আ. থেকে ঈসা আ. পর্যন্ত ১৩৫৬ এবং ঈসা আ. থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৬০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এভাবে আদম আ.-এর ইন্তেকাল থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৫৪৩২ বছর হয়।[২]

---

[১] মুকাদ্দামা নূরুল বাসার ফি সীরাতি খাইরিল বাশার : ১৮

[২] তারীখে দিমাশক, ইবনে আসাকির : ১/৩১, দারুল ফিকর। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

عن محمد بن إسحاق بن يسار قال كان من آدم إلى نوح ألف ومائتا سنة ومن نوح إلى إبراهيم ألف

আদম আ.-এর মোট বয়স এক হাজার বছর।[১] এর মধ্যে ৪৩ বছর জান্নাতে ছিলেন।[২] এরপর তিনি পৃথিবীতে ৯৫৭ বছর অতিবাহিত করেন। এই বছরগুলো হিসাব করলে আদম আ.-এর দুনিয়ায় আগমন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম পর্যন্ত ৬৩৮৯ বছর হয়।[৩]

পৃথিবীতে মানুষের আগমন, আদম আলাইহিস সালাম

আদম আ.-কে আল্লাহ তাআলা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই নতুন সৃষ্টিতে বোঝার, চিন্তা করার, আবেগ প্রকাশের, বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা অন্য সকল সৃষ্টজীব থেকে বেশি ছিল। আল্লাহ তাআলা একে ফেরেশতাদের মতো আনুগত্য করতে বাধ্য বানাননি, আবার জিনদের মতো অনিষ্ট করতে অভ্যস্ত বানাননি; বরং তাকে ভালো-মন্দ উভয়টির ক্ষমতা দিয়েছেন। ফেরেশতারা মানুষের সৃষ্টি দেখে তার কর্ম যোগ্যতা অনুমান করে নেন। তাদের জানা ছিল, ইতঃপূর্বে জিনরা পৃথিবীতে কী পরিমাণ ফেতনা ছড়িয়েছিল। এজন্য তারা আল্লাহর দরবারে বিনীত আবেদন জানান, 'মানুষের বদলে আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে প্রস্তুত আছি।' উত্তরে আল্লাহ বলেন, 'আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।'[৪]

আদম আ.-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের দিয়ে তাঁকে সম্মানসূচক সেজদা করান, যাতে সারা দুনিয়া মানুষের মর্যাদার বিষয়টি জানতে পারে। আদম আ.-কে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তাঁর জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করা হয়। তাঁর নাম হাওয়া রা.। দুজনকে আতিথেয়তার জন্য পাঠানো হয় জান্নাতে।

মানুষের সঙ্গে শয়তানের শত্রুতা

আদম আ. থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে সবচেয়ে বেশি সফলতা দেখিয়েছে শয়তান। শয়তানদের সর্দার ইবলিস জিনদের বংশধর। আদম

ومائة واثنتان وأربعون سنة وبين إبراهيم إلى موسى خمسمائة وخمس وستون سنة ومن موسى إلى داود خمسمائة سنة وتسعة وستون سنة ومن داود إلى عيسى ألف وثلاثمائة وسنة وست وخمسون سنة ومن عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام ستمائة سنة، فذلك خمسة آلاف وأربعمئة واثنان وثلاثون سنة .هذا الإجمال صحيح.

[১] এসব সংখ্যা ও হিসাব অকাট্য নয়। কেননা, এগুলোর ভিত্তি যয়িফ ও মুনকাতি বর্ণনার ওপর।

[২] মুসনাদে আহমাদ : ২২৭০, ২৭১৩, হাদীসটি হাসান লিগাইরিহি।

[৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/২০৮

[৪] সূরা বাকারা : ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামপূর্ব পৃথিবীর অবস্থা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই পরিচ্ছেদ অধ্যয়নের উপকারিতা :

* নবীজির নবুওয়াতপূর্ব পৃথিবীর পরিস্থিতি অনুমান করা যাবে।
* জাহেলি যুগের বিভিন্ন রাজত্ব, সমাজ ও গোত্রের বিশ্বাস, স্বভাব ও সামাজিক অবস্থা জানা যাবে।
* এ কথা বোঝা যাবে এবং অন্যকে বোঝানো যাবে যে, বিগড়ে যাওয়া পরিস্থিতিকে সুন্দর করতে নবীজি কী পরিমাণ অতুলনীয় চেষ্টা করেছেন।
* বর্তমান যুগে প্রচলিত ভ্রষ্টতার বিভিন্ন ধরনকে জাহেলি যুগের চিন্তাগত ভ্রষ্টতার সাথে তুলনা করা যাবে।
* জাহেলি যুগের সাথে ইসলামি যুগের তুলনা করে পৃথিবীর ওপর ইসলামের অনুগ্রহ প্রমাণ করা যাবে।

ইসলামপূর্ব পৃথিবীর অবস্থা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুরো পৃথিবী ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত ছিল। হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্ম প্রত্যেকটিই অল্প কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় নেতারা হেদায়াতের তলব, খোদাভীতি ও আখেরাতের জবাবদিহিতা থেকে উদাসীন ছিল। যে ধর্ম একসময় পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষার আলোকবর্তিকা ছিল, তা তখন বিকৃতির ওপর বিকৃতির শিকার হয়ে বাজারি পণ্যে পরিণত হয়েছিল। নবীদের কিতাব ও সহিফা প্রকৃত রূপে সংরক্ষিত ছিল না।

হিন্দু ধর্ম

সে যুগে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম ছিল সম্ভবত হিন্দু মতবাদ, যা প্রাচ্যে প্রায় পুরো দক্ষিণ এশিয়াকে নিজের অনুসারী বানিয়ে রেখেছিল। এ ধর্ম এমনই গোলকধাঁধার মতো যে, এর নেতারাও তা বুঝতে ও বোঝাতে অক্ষম ছিল।

হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত ৩৩ কোটি দেবতার উপাসনা করা হতো। গরু, বানর, সাপ থেকে নিয়ে ইঁদুরের উপাসনাও করা হতো। প্রত্যেক মহল্লা ও অলিগলিতে পৃথক পৃথক উপাস্য ছিল।

এক হিন্দু ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দুস্তানের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল তাদের খোদার সংখ্যা। এক দেবতার পূজারি অন্যদের দেবতার উপাসনা করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করত। ফলে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, হিন্দু ধর্ম কাকে বলে? তাহলে সম্ভবত উত্তরে এ কথা বলা হতো, প্রত্যেক মূর্তিপূজারি ব্যক্তি হিন্দু। কিন্তু এ উত্তরও ভুল মনে হয় এজন্য যে, হিন্দু নেতারা খোদার অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের নাস্তিক নাম দিয়ে হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে এবং শূদ্রদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে; অথচ শূদ্রদের মন্দিরে আসার অনুমতি ছিল না।

নিকৃষ্ট বিশ্বাসগত পথভ্রষ্টতার পর জাতপাতের বিভেদ ছিল হিন্দু সমাজের আরেকটা দুঃখজনক অধ্যায়। হিন্দুদের কাছে ব্রাহ্মণরা ছিল খোদার সন্তান, সবকিছুর মালিক ও সকল পাপ থেকে পবিত্র। কেননা, তারা ধর্মীয় নেতা ছিল। ক্ষত্রিয়রা রাজনীতি ও সেনাবাহিনী বিষয়ক নেতা ছিল। তারা ব্রাহ্মণদেরকে উপার্জনের ভাবনা থেকে মুক্ত

করে জাতির অবশিষ্ট জনগণকে জুলুম ও ট্যাক্সের জাঁতাকলে পিষ্ট করাকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছিল। তৃতীয় স্তরে ছিল বৈশ্য। তারা ব্যবসা, কৃষি, শিল্প ও চাকরির মাধ্যমে প্রথম দুই স্তরের লোকদের জন্য উপার্জন করে দিত। চতুর্থ স্তরের শূদ্রদের অবস্থা পশুর চেয়েও খারাপ ছিল। তারা উঁচু জাতের লোকদের সাথে বসা তো দূরের কথা, তাদের কোনো বস্তু ছুঁয়েও দেখতে পারত না। তাদেরকে জন্মগতভাবে পাপী, সর্বদা অপরাধী ও দেবতাদের অভিশাপযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাদের প্রত্যেক সদস্য জন্ম থেকেই উঁচু জাতের গোলাম হতো। তাদের ওপর সব ধরনের জুলুম-নির্যাতন করা হতো, কিন্তু নির্যাতনের প্রতিকার চাওয়াও মারাত্মক অপরাধ গণ্য হতো।[১]

শাহ মুঈনুদ্দিন নদবী রহ. লেখেন :

'ব্রাহ্মণদের জন্য কোনো অবস্থাতেই কোনো সাজা ছিল না। অচ্ছুতরা যদি উঁচু জাতের কাউকে স্পর্শ করত, তবে তাদের সাজা ছিল মৃত্যুদণ্ড। নিচু জাতের লোকদের আইনত ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। তাদের চরিত্রের অবস্থা ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক। একেকজন নারী একাধিক স্বামী রাখতে পারত। অনিয়ন্ত্রিত মদপান করা হতো। মদের নেশায় সকল পাপকেই সওয়াবের কাজ মনে করত...। মন্দিরের পূজারিরা ছিল নিকৃষ্ট চরিত্রহীন। দেব দাসীদের চরিত্র লজ্জাজনক পর্যায়ের ছিল। নারীদের ছিল না কোনো মর্যাদা। কোথাও মেয়েদের হত্যা করা হতো। স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলারা বঞ্চিত হতো সকল দুনিয়াবি উপকারিতা থেকে। এজন্য তারা স্বামীর সাথে জীবন্ত পুড়ে মরাকে বেঁচে থাকার ওপর প্রাধান্য দিত।'[২]

বৌদ্ধ ধর্ম

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বড় ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। এর প্রতিষ্ঠাতা শাহজাদা সিদ্ধার্থ, যাকে গৌতম বুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়। হিন্দু ধর্মের জাতপাত ও মানবতা বিবর্জিত রীতিনীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি নির্জনে ধ্যান ও চিন্তাভাবনা করে নতুন এক ধর্ম প্রণয়ন করেন, যাতে সকল মানুষ সমান থাকবে। হিন্দু ধর্ম প্রতিহত করতে তিনি কোটি কোটি দেবতাকে এত শক্তভাবে অস্বীকার করেন যে, এক খোদার প্রবক্তা হওয়াকেও জরুরি মনে করেননি। বুদ্ধ জাতপাতের বিধিনিষেধ থেকে স্বাধীন করার ঘোষণা দিয়ে কোটি মানুষকে আকৃষ্ট করেন; কিন্তু খোদার কল্পনা থেকে শূন্য

[১] মাযা খাসিরাল আলাম বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন, আলী নদবী : ৪৮-৫৩
[২] তারীখে ইসলাম : ১/২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শেষ নবীর সীরাত

লক্ষ ও উদ্দেশ্য

এ পরিচ্ছেদ অধ্যয়নের উপকারিতা :

* নবীজির নবুওয়াতপূর্ব পবিত্র জীবন সম্পর্কে জানা যাবে।
* নবীজির নবুওয়াত ও নবুওয়াতের পর মক্কার জীবন সম্পর্কে জানা যাবে।
* নবীজির মদিনার জীবন সম্পর্কে অবগতি লাভ হবে।
* সীরাতের সার্বিক চিত্র আত্মস্থ হয়ে যাবে।
* ইসলামের দাওয়াত, সমাজসংস্কার ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য সীরাত থেকে উপকৃত হওয়া যাবে।
* ইসলামের জন্য সাহাবিদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে।
* নবীজির পরিবারের অবস্থান ও মর্যাদা জানা যাবে।

শেষ নবীর সীরাত (মক্কার জীবন)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। স্বয়ং নবীজি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنانَةَ مِن ولَدِ إِسْماعِيلَ، واصْطَفَى قُرَيْشًا مِن كِنانَةَ، واصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بَنِي هاشِمٍ، واصْطَفانِي مِن بَنِي هاشِمٍ.

'নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাইলের বংশধরদের মধ্যে কিনানাকে আর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশেমকে আর বনু হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশপরম্পরা হলো : 'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কাব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালেক বিন নযর বিন কিনানা বিন খুযাইমা বিন মুদরিকা বিন ইলয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মুআদ বিন আদনান।' আদনানের পর কয়েক মাধ্যমে নবীজির বংশপরম্পরা ইসমাইল আ.-এর সঙ্গে মিলিত হয়, যিনি ইবরাহিম আ.-এর বড় সাহেবজাদা এবং মনোনীত নবী।[২]

সৌভাগ্যময় জন্ম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হাতির ঘটনার বছর সোমবার ৮ বা ৯ রবিউল আউয়াল কুরাইশ সর্দার আবদুল মুত্তালিবের বংশে হয়। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ, মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহাব। জন্মের কিছুদিন আগে তাঁর পিতা মদিনায় ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।[৩]

দুগ্ধপান

শুরুতে কিছুদিন চাচা আবু লাহাবের বাঁদি সুওয়াইবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করান। এরপর তাঁকে বনু সাদ গোত্রের ধাত্রী হালিমা

---

[১] সহিহ মুসলিম : ২২৭৬
[২] সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/১২৩
[৩] সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/১২৩

সাদিয়ার দায়িত্বে দেওয়া হয়। তিনি দুধ পানের সময়সীমা পর্যন্ত তাঁকে দুধ পান করান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেড়ে ওঠা ছিল সাধারণ শিশুদের চেয়ে ব্যতিক্রম। দুই বছর বয়স হওয়ার পর হালিমা সাদিয়া দুধ ছাড়িয়ে দেন। নবীজি দুধ ভাই-বোনদের সঙ্গে বকরি চরাতে ময়দানে যেতে থাকেন। এ সময় একদিন হঠাৎ দুই ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে আসেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড থেকে কালো রক্তপিণ্ডের মতো কিছু একটা বের করে ফেলে দেন এবং অন্তরকে ঈমান ও হেকমতে পরিপূর্ণ করে পুনরায় সেটাকে যথাস্থানে রেখে দেন। এরপর নবীজির দেহে বুক চিরে ফেলার কোনো চিহ্ন বাকি থাকেনি।[১]

লালনপালন

হালিমা সাদিয়ার কাছ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর নবীজির বয়স যখন ছয়, তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে ইয়াসরিব রওনা হন স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এবং নানাবাড়ির লোকদের সঙ্গে সন্তানকে পরিচয় করিয়ে দিতে। ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে আকস্মিকভাবে আমিনা ইন্তেকাল করেন। তারপর আবদুল মুত্তালিব তার এই এতিম নাতিকে স্নেহের চাদরে ঢেকে নেন। নবীজির বয়স ৮ বছর হলে দাদাজানও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তারপর চাচা আবু তালিব তার দেখাশোনার দায়িত্ব নেন।[২]

পবিত্র শৈশব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, লাজুক ও গম্ভীর ছিলেন। তিনি আরবের সামাজিক মন্দ বিষয় দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। শিরকি কর্মকাণ্ড, মদপান ও গান-বাদ্য থেকে শত মাইল দূরে ছিলেন। সততা, আমানতদারি, সহমর্মিতা, বিনয়, আত্মমর্যাদাবোধ ও কোমলতার গুণ রাসূলের মাঝে ভরপুর ছিল।[৩]

ফিজার যুদ্ধ

নবীজির বয়স ১৪/১৫ বছর হলে কুরাইশ ও বনু কায়সের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং 'তৃতীয় ফিজার যুদ্ধ' আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে কুরাইশরা সত্যের

---

[১] সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/১৬২-১৬৪

[২] সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/১৬৭-১৭৯

[৩] আস সীরাতুল হালাবিয়া : ১/১৭৮